Se. Tec Edu
বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
07 SEP 19[illegible]
014

…ক ইনকিলাব

শিক্ষা ও বিজ্ঞান

সাক্ষরতা ও দেশের উন্নয়ন

—ডঃ মোঃ শামসুল হক মিয়া

তানজানীয়ার প্রেসিডেন্ট জুলিয়াস কে, নায়ারেরে বলেছেন, উন্নয়নের অংশ হিসেবে শিক্ষা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে উন্নয়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মুক্তি। একজন মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি ও উন্নতি নির্ভর করে তার নিজেরই উপর। অন্য মানুষ তাকে সত্যিকারিভাবে মুক্ত কিংবা উন্নত করতে পারে না। নিজেকে গড়ে তোলা মানুষের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। একটি সুনির্বাচিত বা কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষমতাই তাকে অন্যসব প্রাণী থেকে পৃথক করেছে। সুতরাং চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নয়ন বলতে আমরা যা বুঝি তা হচ্ছে প্রত্যেকটি মানুষের আত্মসচেতনতার উন্মেষ ও প্রসাণ। অন্য কথায় নিজের উপর এবং পরিবেশ ও সমাজের উপর তার কর্তৃত্ব স্থাপন। বাংলাদেশে উন্নয়নের অন্যতম সমস্যা হচ্ছে শিক্ষার অনগ্রসরতা। দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টিতে এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নে শিক্ষা প্রসারের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

শিক্ষার লক্ষ্য হবে অজ্ঞতা ও পরনির্ভরশীলতার সীমাবদ্ধতা এবং প্রতিবন্ধকতা থেকে সার্বিক মুক্তি। যে শিক্ষা দাসসুলভ বা অক্ষমতার মনোভাব গড়ে তোলে তা প্রকৃত শিক্ষা নয়; এ হচ্ছে মানুষের মনের উপর এক প্রকার আক্রমণ. শিক্ষাকে উন্নয়নের সহায়ক হতে হলে একে জীবনাশ্রয়ী হতে হবে। হতে হবে জীবনের সহিত সম্পৃক্ত ও সমন্বিত। শিক্ষা এমন কোন জিনিস নয় যা বাক্সবন্দী করে রাখা যায় এবং প্রয়োজন মত দিনের, সপ্তাহের বা জীবনের কিছুকালের জন্য তা বের করা হয়। কারণ জ্ঞানার্জন বা এই জ্ঞানের প্রতীক হিসেবে একখণ্ড কাগজ হস্তগত করার সাথে উন্নয়নের কোন সম্পর্ক নেই। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবনের গুণগতমান উন্নয়ন।

ইউনেস্কোর সংজ্ঞা অনুযায়ী যে ব্যক্তি তার দৈনন্দিন জীবন সহজ বিবরণ পড়ে, বুঝতে ও লিখতে পারে সেই সাক্ষর। অর্থাৎ সাক্ষরতা বলতে বুঝায় দৈনন্দিন জীবনে পর্যাপ্ত ব্যবহারোপযোগী পঠন, লিখন ও গননার ক্ষমতার্জন। কেউ কোনমতে শুধুমাত্র তার নিজের নাম সই করতে পারলেই চল্লিশের দশক ও তাকে সাক্ষর বলে গণ্য করা হ'ত। বর্তমানে এ ভুল ধারণা পরিবর্তন হয়েছে। শুধুমাত্র নিজের নাম দস্তখত করতে পারে অথচ তার বাইরে আর কোন শব্দ লিখতে পারে না বা লিখিত শব্দ পড়তে পারে না এরূপ ব্যক্তিকে সাক্ষর বলে গণ্য করার আদৌ কোন যুক্তিই নাই।

ইউনেস্কোর এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, ইদানিং সারা পৃথিবীতে নিরক্ষরদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। ১৯৯০ সাল নাগাদ সমগ্র বিশ্বে নিরক্ষরদের সংখ্যা দাঁড়াবে ৮৮ কোটি ৪০ লাখে। এ কথা বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য যে, তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশগুলোতেই নিরক্ষরদের সংখ্যা বাড়ছে দ্রুতগতিতে। অথচ একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

দিন দিন নিরক্ষরদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ হচ্ছে দুনিয়ার প্রায় সর্বত্রই জনসংখ্যা বাড়ছে সমগ্র জনগোষ্ঠীর একটা বিরাট অংশেরই ভাগ্যে লেখাপড়ার সুযোগ-সুবিধা ঘটে না। জন্মের পর থেকেই তারা ক্ষুধা ও রোগ-শোকের সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে একদিন ঢলে পড়ে মৃত্যুর কোলে। এভাবেই তারা আজীবন শিক্ষার আলো থেকে থাকে বঞ্চিত। বাংলাদেশে নিরক্ষরতার চিত্র অত্যন্ত করুণ। জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ অর্থাৎ প্রায় ৭০% লোক এখনো অক্ষরজ্ঞানহীন। এখনো বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল ছেলে-মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়নি। বাংলাদেশ বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ৬-১০ বছর বয়সের ছেলে-মেয়ের সংখ্যা প্রায় ১৩৮ লাখ। এরমধ্যে প্রায় ৮৫ লাখ বা ৬১% জন ছেলে-মেয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায়। বাকী ৫৩ লাখ বা ৩৯% ছেলে-মেয়ে বিদ্যালয়ে যায় না। অর্থাৎ দেখা যায় যে, প্রতিবছর প্রায় অর্দ্ধ কোটি শিশু বিদ্যালয়ের বাইরেই থেকে যাচ্ছে। এ ছাড়া, আর একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, দ্বিতীয় শ্রেণীতেই অধিকাংশ শিশু স্কুল ত্যাগ করে। স্বল্প মেয়াদী এই শিক্ষা তাদের জন্য কোন কাজেই লাগে না। এবং কালক্রমে তারা আবার নিরক্ষর হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশে এ চিত্র অত্যন্ত ভয়াবহ। দেশকে উন্নত এবং স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে হলে অবশ্যই এ দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে হবে।

বাংলাদেশে নিরক্ষরতা দূরাকরণের ক্ষেত্রে আমরা বিশ্বের অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পারি। ল্যাটিন আমেরিকার নিকারাগুয়ায় বিপ্লবের অব্যাহতি পরেই নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে এক ব্যাপক অভিযান শুরু হয়। ১ লাখ ৩০ হাজার স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক নিরক্ষরতার দূরীকরণে সর্বাত্মক অভিযান শুরু করেন। তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন ১২শ' কিউবান শিক্ষক। তাঁরা শহর, বন্দর, নগর এবং গ্রাম-গঞ্জের নিরক্ষর, শ্রমিক ও কৃষকদেরকে অক্ষরজ্ঞান দিতে শুরু করেন। ১৯৮০ সালকে নিকারাগুয়ায় "এডুকেশন ইয়ার বা শিক্ষাবর্ষ" রূপে ঘোষণা করা হয়। এ ঘোষণার ফলে গোটা দেশটাই পরিণত হয় একটা বিরাট শিক্ষায়তনে। দেশের সকল নাগরিক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীতে রূপান্তরিত হয়ে ওঠে। স্যাণ্ডিনিস্টদের দৃঢ় সংকল্প ও বিশ্বাস ছিলঃ "আমরা যখন একনায়কত্বকে পরাভূত করেছি, তখন নিরক্ষরতাকেও পরাজিত করতে পারবো"। তারা তাদের এই সংকল্পকে নিষ্ঠা ও সাফল্যের সঙ্গে বাস্তবায়িত করেছে। অনুরূপ সংকল্প নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে আফ্রিকার একটি দেশ— ইথিওপিয়া। প্রতি বছর সেখানে লাখ লাখ নিরক্ষরকে শিক্ষার আওতায় আনা হচ্ছে। ইথিওপিয়ার সরকার মনে করছেন ১৯৯০ সালের মধ্যে সেখানে আর কেউ নিরক্ষর থাকবে না। নিকারাগুয়া ও ইথিওপিয়ার অভিযান থেকে এটাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, কোন সমস্যাকে প্রকৃত সমস্যারূপে চিহ্নিত করে যদি আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে তার সমাধানে ব্রতী হওয়া যায় তবে তার সমাধান অনিবার্য।

এই শতাব্দীর গোড়ার দিকেও সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল একটি অনগ্রসর কৃষি প্রধান দেশ। অথচ সংক্ষিপ্ততম সময়ের মধ্যে সে দেশটি পরিণত হয়েছে একটি আধুনিক ও সমৃদ্ধ দেশ। এটা সম্ভব হয়েছে সে দেশের সংগ্রামী মানুষের নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে।

বাংলাদেশেও নিরক্ষরতা দূরীকরণে বাস্তব কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে এবং সে কর্মসূচী বাস্তবায়নে সকল সময়ের দেশবাসীর একাত্ম হয়ে শুরু করতে হবে এক ব্যাপক অভিযান। শুধুমাত্র গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজ সম্পাদনে অংশগ্রহণে উৎসাহ প্রদান এবং উৎপাদন কার্যক্রম, বিশেষ করে, কৃষি খাতে উৎপাদন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার প্রচেষ্টাতেই নয়, উপরন্তু জাতীয় উন্নয়নের সাধারণ গতিধারা দ্রুততর করার জন্যও জনগণের নিরক্ষরতা মোচন করা প্রয়োজন। যত শীঘ্র সম্ভব, কল-কারখানা ও কৃষি ক্ষেত্রে নিয়োজিত শ্রমিকদেরকে সাক্ষর করে তুলতে হবে। এ ব্যাপারে সরকারকে বাস্তবমুখী কার্যসূচী নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানে শিক্ষক ও ছাত্রদেরকে বিশেষ করে সমাজ ও জাতির সেবামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসাবে সক্রিয় ভূমিক্বা গ্রহণ করতে হবে।

পরিশেষে, সরকার যত উদ্যোগই নেন আর যত পরিকল্পনাই গ্রহণ করেন, এর সাথে দেশের আপামর জনসাধারণের সার্বিক সহযোগিতা না থাকলে সরকারী কোন কর্মসূচীই সফল হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে নিরক্ষরতা দূরীকরণ দেশের প্রতিটি মানুষের নাগরিক দায়িত্ব। বিশেষ করে প্রতিটি শিক্ষিত নাগরিকেরই উচিত তাদের সন্তানদের, তাদের আত্মীয় এবং প্রতিবেশীর সন্তানদের তথা দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত করার সরকারী প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করতে সহযোগিতার [illegible]

তানজানীয়ার প্রেসিডেন্ট জুলিয়াস কে, নায়ারেরে বলেছেন, উন্নয়নের অংশ হিসেবে শিক্ষা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে উন্নয়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মুক্তি। একজন মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি ও উন্নতি নির্ভর করে তার নিজেরই উপর। অন্য মানুষ তাকে সত্যিকারিভাবে মুক্ত কিংবা উন্নত করতে পারে না। নিজেকে গড়ে তোলা মানুষের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। একটি সুনির্বাচিত বা কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষমতাই তাকে অন্যসব প্রাণী থেকে পৃথক করেছে। সুতরাং চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নয়ন বলতে আমরা যা বুঝি তা হচ্ছে প্রত্যেকটি মানুষের আত্মসচেতনতার উন্মেষ ও প্রসাণ। অন্য কথায় নিজের উপর এবং পরিবেশ ও সমাজের উপর তার কর্তৃত্ব স্থাপন। বাংলাদেশে উন্নয়নের অন্যতম সমস্যা হচ্ছে শিক্ষার অনগ্রসরতা। দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টিতে এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নে শিক্ষা প্রসারের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

শিক্ষার লক্ষ্য হবে অজ্ঞতা ও পরনির্ভরশীলতার সীমাবদ্ধতা এবং প্রতিবন্ধকতা থেকে সার্বিক মুক্তি। যে শিক্ষা দাসসুলভ বা অক্ষমতার মনোভাব গড়ে তোলে তা প্রকৃত শিক্ষা নয়; এ হচ্ছে মানুষের মনের উপর এক প্রকার আক্রমণ. শিক্ষাকে উন্নয়নের সহায়ক হতে হলে একে জীবনাশ্রয়ী হতে হবে। হতে হবে জীবনের সহিত সম্পৃক্ত ও সমন্বিত। শিক্ষা এমন কোন জিনিস নয় যা বাক্সবন্দী করে রাখা যায় এবং প্রয়োজন মত দিনের, সপ্তাহের বা জীবনের কিছুকালের জন্য তা বের করা হয়। কারণ জ্ঞানার্জন বা এই জ্ঞানের প্রতীক হিসেবে একখণ্ড কাগজ হস্তগত করার সাথে উন্নয়নের কোন সম্পর্ক নেই। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবনের গুণগতমান উন্নয়ন।

ইউনেস্কোর সংজ্ঞা অনুযায়ী যে ব্যক্তি তার দৈনন্দিন জীবন সহজ বিবরণ পড়ে, বুঝতে ও লিখতে পারে সেই সাক্ষর। অর্থাৎ সাক্ষরতা বলতে বুঝায় দৈনন্দিন জীবনে পর্যাপ্ত ব্যবহারোপযোগী পঠন, লিখন ও গননার ক্ষমতার্জন। কেউ কোনমতে শুধুমাত্র তার নিজের নাম সই করতে পারলেই চল্লিশের দশক ও তাকে সাক্ষর বলে গণ্য করা হ'ত। বর্তমানে এ ভুল ধারণা পরিবর্তন হয়েছে। শুধুমাত্র নিজের নাম দস্তখত করতে পারে অথচ তার বাইরে আর কোন শব্দ লিখতে পারে না বা লিখিত শব্দ পড়তে পারে না এরূপ ব্যক্তিকে সাক্ষর বলে গণ্য করার আদৌ কোন যুক্তিই নাই।

ইউনেস্কোর এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, ইদানিং সারা পৃথিবীতে নিরক্ষরদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। ১৯৯০ সাল নাগাদ সমগ্র বিশ্বে নিরক্ষরদের সংখ্যা দাঁড়াবে ৮৮ কোটি ৪০ লাখে। এ কথা বিশেষভাবে

সার্বিক উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

দিন দিন নিরক্ষরদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ হচ্ছে দুনিয়ার প্রায় সর্বত্রই জনসংখ্যা বাড়ছে সমগ্র জনগোষ্ঠীর একটা বিরাট অংশেরই ভাগ্যে লেখাপড়ার সুযোগ-সুবিধা ঘটে না। জন্মের পর থেকেই তারা ক্ষুধা ও রোগ-শোকের সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে একদিন ঢলে পড়ে মৃত্যুর কোলে। এভাবেই তারা আজীবন শিক্ষার আলো থেকে থাকে বঞ্চিত। বাংলাদেশে নিরক্ষরতার চিত্র অত্যন্ত করুণ। জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ অর্থাৎ প্রায় ৭০% লোক এখনো অক্ষরজ্ঞানহীন। এখনো বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী

নিষ্ঠা ও সাফল্যের সঙ্গে বাস্তবায়িত করেছে। অনুরূপ সংকল্প নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে আফ্রিকার একটি দেশ— ইথিওপিয়া। প্রতি বছর সেখানে লাখ লাখ নিরক্ষরকে শিক্ষার আওতায় আনা হচ্ছে। ইথিওপিয়ার সরকার মনে করছেন ১৯৯০ সালের মধ্যে সেখানে আর কেউ নিরক্ষর থাকবে না। নিকারাগুয়া ও ইথিওপিয়ার অভিযান থেকে এটাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, কোন সমস্যাকে প্রকৃত সমস্যারূপে চিহ্নিত করে যদি আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে তার সমাধানে ব্রতী হওয়া যায় তবে তার সমাধান অনিবার্য।

এই শতাব্দীর গোড়ার দিকেও

সাক্ষরতা ও দেশের উন্নয়ন

—ডঃ মোঃ শামসুল হক মিয়া

সকল ছেলে-মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়নি। বাংলাদেশ বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ৬-১০ বছর বয়সের ছেলে-মেয়ের সংখ্যা প্রায় ১৩৮ লাখ। এরমধ্যে প্রায় ৮৫ লাখ বা ৬১% জন ছেলে-মেয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায়। বাকী ৫৩ লাখ বা ৩৯% ছেলে-মেয়ে বিদ্যালয়ে যায় না। অর্থাৎ দেখা যায় যে, প্রতিবছর প্রায় অর্দ্ধ কোটি শিশু বিদ্যালয়ের বাইরেই থেকে যাচ্ছে। এ ছাড়া, আর একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, দ্বিতীয় শ্রেণীতেই অধিকাংশ শিশু স্কুল ত্যাগ করে। স্বল্প মেয়াদী এই শিক্ষা তাদের জন্য কোন কাজেই লাগে না। এবং কালক্রমে তারা আবার নিরক্ষর হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশে এ চিত্র অত্যন্ত ভয়াবহ। দেশকে উন্নত এবং স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে হলে অবশ্যই এ দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে হবে।

বাংলাদেশে নিরক্ষরতা দূরাকরণের ক্ষেত্রে আমরা বিশ্বের অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পারি। ল্যাটিন আমেরিকার নিকারাগুয়ায় বিপ্লবের অব্যাহতি পরেই নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে এক ব্যাপক অভিযান শুরু হয়। ১ লাখ ৩০ হাজার স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক নিরক্ষরতার দূরীকরণে সর্বাত্মক অভিযান শুরু করেন। তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন ১২শ' কিউবান শিক্ষক। তাঁরা শহর, বন্দর, নগর এবং গ্রাম-গঞ্জের নিরক্ষর, শ্রমিক ও কৃষকদেরকে অক্ষরজ্ঞান দিতে শুরু করেন। ১৯৮০ সালকে নিকারাগুয়ায় "এডুকেশন ইয়ার বা শিক্ষাবর্ষ" রূপে ঘোষণা করা হয়। এ ঘোষণার ফলে গোটা দেশটাই পরিণত হয় একটা বিরাট শিক্ষায়তনে। দেশের সকল নাগরিক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীতে

সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল একটি অনগ্রসর কৃষি প্রধান দেশ। অথচ সংক্ষিপ্ততম সময়ের মধ্যে সে দেশটি পরিণত হয়েছে একটি আধুনিক ও সমৃদ্ধ দেশ। এটা সম্ভব হয়েছে সে দেশের সংগ্রামী মানুষের নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে।

বাংলাদেশেও নিরক্ষরতা দূরীকরণে বাস্তব কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে এবং সে কর্মসূচী বাস্তবায়নে সকল সময়ের দেশবাসীর একাত্ম হয়ে শুরু করতে হবে এক ব্যাপক অভিযান। শুধুমাত্র গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজ সম্পাদনে অংশগ্রহণে উৎসাহ প্রদান এবং উৎপাদন কার্যক্রম, বিশেষ করে, কৃষি খাতে উৎপাদন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার প্রচেষ্টাতেই নয়, উপরন্তু জাতীয় উন্নয়নের সাধারণ গতিধারা দ্রুততর করার জন্যও জনগণের নিরক্ষরতা মোচন করা প্রয়োজন। যত শীঘ্র সম্ভব, কল-কারখানা ও কৃষি ক্ষেত্রে নিয়োজিত শ্রমিকদেরকে সাক্ষর করে তুলতে হবে। এ ব্যাপারে সরকারকে বাস্তবমুখী কার্যসূচী নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানে শিক্ষক ও ছাত্রদেরকে বিশেষ করে সমাজ ও জাতির সেবামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসাবে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

পরিশেষে, সরকার যত উদ্যোগই নেন আর যত পরিকল্পনাই গ্রহণ করেন, এর সাথে দেশের আপামর জনসাধারণের সার্বিক সহযোগিতা না থাকলে সরকারী কোন কর্মসূচীই সফল হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে নিরক্ষরতা দূরীকরণ দেশের প্রতিটি মানুষের নাগরিক দায়িত্ব। বিশেষ করে প্রতিটি শিক্ষিত নাগরিকেরই উচিত তাদের সন্তানদের, তাদের আত্মীয় এবং প্রতিবেশীর সন্তানদের তথা দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের